গুজারিশ

মাজিদা রিফা

১.

বড্ড জেদি মেয়েটা। বেখেয়ালি। ফুল ফুটল না বলে গাছ উপড়ে ফেলার মতো অভিমান নেই; সে গাছের দিকে ফিরেও তাকায় না। সে খেয়াল করে না মৌসুম কত বার বদলায়। জানে না কোন ঋতুতে ফুল ফোটে আর কোন ঋতু ভীষণ একা! অপেক্ষা করে না বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টির শীতল ছোঁয়ায় ভিজে যায় তার কালবৈশাখি কোঁকড়ানো চুলে জড়ানো ওড়না; মেয়েটা খুশি হয় না, বিরক্তও হয় না। শীতের সকালে মিষ্টি রোদের চাদর ওম দেয় দাদির সাথে পাটি বিছিয়ে উঠানে-বসে-থাকা আনমনা মেয়েটাকে; তবু কেন যেন রোদের সাথেও মেয়েটির সখ্য নেই। পৃথিবী নামক ছোট্ট গ্রহটির বনে-বাদাড়ে বুনোফুল কার জন্য ফোটে, মেয়েটার তাতে কোনো পরোয়া নেই। সে শুধু তার পুরোনো সাইকেলটি নিয়ে শহরতলির শেষ বাড়িটি থেকে বেরিয়ে বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে হারিয়ে যায়। যেখানে যায় সেখানে—বাতাসের সমীরণ ছেড়ে, ফুলেদের সুবাস ফেলে, পাখিদের গান রেখে, সে হারিয়ে যায় বইয়ের জগতে। পাঠশালায় বান্ধবীদের কাছ থেকে ব্যাগে লুকিয়ে যে বইগুলো সে আনে, তা দিগন্তের শেষ মাথার ওই আধভাঙা বাড়িটাতে না হারালে যে কিছুতেই পড়ে শেষ করা যায় না! তাই দাদির বকুনি আর মায়ের দুঃশাসন উপেক্ষা করেই সে পালায়।

বইপাগল এই মেয়েটি আফসানার পাঁচ কন্যার মধ্যে তৃতীয়। নাম তার রাবিয়া। আফসানা তাকে রোজ রোজ এক পশলা বকা দিয়ে বলেন, 'কাল যদি দেখি ঘর থেকে বের হয়েছিস, তোর ঠ্যাং ভেঙে দিব।'

পরের দিন বিকেলবেলা আবারও রাবিয়াকে খুঁজে না পাওয়ার পর সন্ধ্যা শেষে ঠ্যাং না ভাঙলেও বকুনির ঝড় যখন শুরু হয়, রাবিয়া *মসনবি* থেকে দুটো যথোপযুক্ত চরণ অর্থসহ আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিলে রাবিয়ার পিতাজি মিটিমিটি হাসেন, আর আফসানা আরও রেগে গিয়ে নির্দ্বিধায় দুটো চড়-থাপ্পড় রাবিয়ার পিঠে বসিয়ে দেন। রাবিয়ার তাতে মোটেই শিক্ষা হয় না। মেয়েটাকে নিয়ে যে কী করা যায় ভেবে ভেবে দিশেহারা হতে হয় নিয়মিত! যথারীতি ফাঁক পেয়ে আজও সে হারিয়েছে। আফসানা খোঁজ করেছেন বারকয়েক, তার টিকিটিরও দেখা নেই। সে দিকে নিদারুণ ব্যস্ততায় ডুবে আছে রান্নাঘর। গ্রীষ্মকালের তীব্র গরমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পেঁয়াজ, রসুন, মশলার কৌটা, তেলের বোতল, হাড়ি কড়াই-সহ অনেক কিছু। চুলো দুটোতেও লকলক করছে আগুন। এই মুহূর্তে রান্নাঘর থেকে বের হওয়া অসম্ভব, তবু রান্নাঘর থেকে বের হয়ে রাবিয়া রাবিয়া বলে চিৎকার করে ডাকাডাকি করার পরও রাবিয়ার সাড়া পাওয়া গেল না। বাইরে কড়া হলুদ রঙের রোদ। এই মধ্যদুপুরে সে কোথায় বের হয়ে গেছে কে জানে!

বিকেলে আমিনাকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। আমিনার অন্য তিনটি বোন সকাল থেকে বড়বোনকে ঘিরে ধরে দুষ্টুমি করছে, খিলখিল হাসছে, একে অন্যের গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। কিন্তু এসবে রাবিয়ার কোনো উৎসাহ নেই। মেয়েটা কেন যে এমন, আফসানা বুঝতে পারেন না। আমিনা ও আসমার পর রাবিয়ার যখন জন্ম হয়েছিল তখন পিতা উসমান সাহেবের মুখ খুশিতে চকচক করে উঠলেও, আফসানার মুখখানায় অন্ধকার ছেয়ে গিয়েছিল। এই সমাজে অধিক কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়া মানেই এর-ওর একশো

একটা মন্তব্য শোনা। 'এতগুলো মেয়ের বিয়ে হবে কীভাবে? বাবা মাকে শেষ বয়সে খাওয়াবে কে? মেয়েগুলোরও তো ভাই দরকার'—আরও অনেক দুশ্চিন্তা পাড়া-পড়শির। আফসানা সদ্যোজাত শিশুটিকে যতটা অবহেলা দেখালেন, উসমান সাহেব তার চেয়ে শত গুণ আহ্লাদ করে সে কমতিকে পুষিয়ে দিলেন। সাত দিনের দিন মেয়ের নাম রাখলেন 'রাবিয়া' আর বললেন, 'রাবিয়া বসরির কাহিনি কতটা সত্য জানি না, তবে আমার এই মেয়ে হবে সত্যিকারের তাপসী; ওর নাম রাখলাম রাবিয়া।' কয়েক দিনের মধ্যেই উসমান সাহেবের অবস্থা হল দেখার মতো। যেন সত্যিই তার ঘরে বড় হচ্ছে প্রভুর প্রেরিত কোনো দরবেশ। মেয়ে রাতে উঁ করতে পারে না, তিনি লাফ দিয়ে উঠে কাঁথা বদলে দেন, মেয়েকে নিয়ে আল্লাহ আল্লাহ জপেন আর ঘরময় হাঁটাহাঁটি করেন। একদিন রেগে গিয়ে আফসানা বললেন, 'আল্লাহর ওয়াস্তে ওকে বিছানায় নামিয়ে রাখুন, তারপর আপনিও ঘুমান। অনেক তো হল, এবার আহ্লাদ একটু কমান।'

উসমান সাহেব বললেন, 'এত আওয়াজ কোরো না তো, মেয়েটাকে ঘুমুতে দাও।'

আফসানা হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি আপনার কন্যাদের এত আহ্লাদ করেন বলেই আমার একের পর এক মেয়ে হচ্ছে!'

উসমান সাহেব বড্ড অবাক হলেন—'কন্যাকে আহ্লাদ করব না তো কী করব, কন্যা মানেই তো আহ্লাদ! এ যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ!'

'তা আমি জানি, আপনি জানেন, কিন্তু এই সমাজ জানে না।'

'সমাজের কথা আসছে কেন?' অবাক হলেন উসমান সাহেব।

'সমাজের কথা আসছে সমাজে বাস করি বলে। একের পর এক মেয়ে হচ্ছে, লোকে কথা শুনিয়ে শুনিয়ে আমার কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে।' পাশ ফিরে শুতে শুতে বললেন আফসানা।

উসমান সাহেব স্ত্রীর কথা শুনে খুব কষ্ট পেলেন। মানুষ এই যুগে এসেও জাহেলের মতো আচরণ করছে! কন্যা জন্ম নিচ্ছে উসমান সাহেবের ঘরে, অসুবিধা হচ্ছে তাদের! আর পাড়া-পড়শীর কথায় মন খারাপ করার মতো মানুষ আফসানা কবে থেকে হলেন!

আফসানা এরপর থেকে দিনরাত দোয়া করতে থাকলেন, ভবিষ্যতে যেন ছেলে হয়। দোয়া কবুল হল না। পরের দুই বছরে পরপর আরও দুটি সন্তান হল। দুটিই মেয়ে—সাদিয়া আর নাদিয়া। ডাকনাম রাখা হল রাহা ও নুহা। আফসানা আগের মতো ততটা মনখারাপ করলেন না। মেয়েদুটি দেখতে হয়েছে হুরের মতো। গায়ের রং ধবধবে ফরসা। যে-ই আসে, ওদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করে। বিয়েশাদি নিয়ে ঝামেলায় পড়তে হবে না। আসমাও দারুণ সুন্দরী, গায়ের রং একদম বিদেশি মেমদের মতো। আফসানার এখন যত চিন্তা আমিনা ও রাবিয়াকে নিয়ে। আমিনা একটু বেশিই কালো। উসমান সাহেবের রং পেয়েছে সে। আফসানা শুনেছেন, উসমান সাহেবের পিতা তার চেয়েও কালো ছিলেন। মেয়েরা তাদের দাদার গায়ের রং পায়নি বলে আফসানা রবের শুকরিয়া আদায় করেন। এ সমাজে চেহারা মিষ্টি হলেও লাভ নেই, লোকজনের কাছে গায়ের রংই সব। কনে দেখতে এসে লোকজন প্রথমেই দেখে মেয়ে কতটা ফরসা। আমিনাকে কয়েকবার কনে দেখিয়ে খুবই খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে আফসানার। আমিনা এত ভালো, এত মুআদ্দাব একটা মেয়ে। আত্মীয়স্বজন যে-ই আসে, ওর আচার-ব্যবহারের প্রশংসা না করে থাকতে পারে না। এমন সাধু মেয়ের ভালো একটা বিয়ে কপালে জুটছে না শুধু কালো বলে। সে দিকে রাবিয়ার গায়ের রং ততটা কালো না হলেও আসমা ও রাহা-নুহার কাছে দাঁড়ালে ফিকে তো লাগেই; তার ওপর সে এক মহাঝড়। বাবা চেয়েছিলেন সে হবে তাপসী, সে হয়েছে একদম উলটো। যা ইচ্ছা করবে, যেভাবে ইচ্ছে ঘুরবে, পাখির মতো নিজের মনে উড়বে, গান গেয়ে বেড়াবে। কে শুনল, কেউ দেখল কি না,

তাতে তার কিচ্ছু যায় আসে না। আফসানা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন। ওর বয়স ১২ চলছে। এক্ষুনি ওর লাগাম টেনে ধরতে হবে, না হলে কখন কী ঘটনা ঘটাবে বলা যায় না।

আফসানা চুলার আগুন নিভিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। রান্নাঘরটা বাড়ির পেছন দিকে। রান্নাঘরের সামনে বিশাল খাওয়ার ঘর তারপর করিডোর। করিডোরের ডান দিকে একে একে তিনটি ঘর। দুইটা ঘর খালি, রাবিয়ার ফুপুরা নাইওর এলে থাকে। আর একদম সামনের ঘরটি বসার ঘর। করিডোরের বাম দিকেও তিনটি ঘর। প্রথমটি আফসানার শোবার ঘর। এরপরের ঘরটিতে দুটো বিছানার একটাতে আসমা ও নুহা ঘুমায়, অন্য বিছানায় আমিনা ও রাহা ঘুমায়। এরপরে একদম সামনের ঘরটিতে নানাবিধ পুরোনো আসবাবপত্র রাখা বলে একটা মাত্র খাট। সেই খাটে রাবিয়া ঘুমায় ওর দাদি মরিয়ম বিবির সাথে। আফসানা কামরার সামনে এসে নিচু গলায় মেয়েকে আবারও ডাকাডাকি করলেন। কোনো উত্তর নেই। তিনি ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন মরিয়ম বিবি বেঘোরে ঘুমাচ্ছেন। শাশুড়ির দুপুরে ঘুমানোর অভ্যাস বহু পুরোনো। তিনি সন্তর্পণে রান্নাঘরে ফিরে আসবেন বলে পা বাড়ালে শুনলেন, আমিনাদের কামরাটি হাসির ধমকে কাঁপছে। আফসানা ওদের দরজায় এসে দাঁড়ালেন। মাকে দেখে মেয়েরা হাসি বন্ধ করে হাসিমুখে তাকাল। আমিনার সামনে সাজগোজের সরঞ্জাম। মনের মাধুরী মিশিয়ে বোনেরা বিকেলে আমিনাকে সাজানোর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে রাখছে।

আফসানা এগিয়ে এসে আমিনার সামনে চেয়ার টেনে বসলেন। মেয়েটি মাথা নিচু করে বিছানার এক কোণে বসে আছে। তার মুখখানি ছোট হয়ে আছে। এমন দণ্ডিত-পরাজিত মুখ আফসানা আর কখনও দেখেননি। কনে দেখার সময় শুধু কালো মেয়েদেরই কি এই অবস্থা হয়? বিনা অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামির মতো? আফসানার বুকটা হু হু করে উঠল। ইচ্ছে হল মেয়েটাকে একটু

জড়িয়ে ধরতে, কিন্তু জড়তার কারণে পারলেন না। সন্তানদের সাথে তার জড়াজড়ির সম্পর্ক নেই। শাসন এবং মূর্তিমান দারোয়ানিটাই তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারেন। আমিনা মার দিকে তার দীঘল কালো ভীত চোখজোড়া তুলে তাকাতেই আফসানা কণ্ঠে কাঠিন্য এনে বললেন, 'সুরা ফাতিহা পড়ে শোনা তো দেখি, সুরা ফাতিহা কেউ ভোলে কখনও?' রাহা ও নুহা ফিক করে হেসে ফেলল। আফসানা ওদের দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালেন। তারপর আমিনাকে আবার বললেন, 'তাড়াতাড়ি পড়, মা! অনেক কাজ বাকি, সময় নেই আমার।' আমিনা গড়গড় করে সুরা ফাতিহা পড়ল।

'ওদের সামনে গেলে ভুলে যাবি না তো?' সতর্ক করে দিলেন তিনি।

আমিনা মাথা নাড়ল।

আফসানা মেয়ের হাত ধরলেন। তারপর সামান্য নরম গলায় বললেন, 'দ্যাখ মা, এবারও যদি তোকে বরপক্ষ ফেলে যায়, তাহলে এইবার আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। লোকজন মনে করবে এই বাড়ির মেয়েগুলোর অন্য কোনো দোষ আছে, বরপক্ষ কনে দেখতে এসে প্রত্যেকবার ফিরে যায়। একটা বাজে বদনাম হয়ে যাবে না বল? তোর বোনদের আর সহজে বিয়ে হবে? ভালো প্রস্তাব আসবে?' একটু থেমে আফসানা আবার বললেন, 'গতবার ছেলেপক্ষ তোকে ঠিকই পছন্দ করল, কিন্তু তুই কী করলি মা, সুরা ফাতিহা পড়তে পারলি না। সুরা ফাতিহা তো একটা মূর্খও পড়তে পারে, আর তুই তো আলেমের মেয়ে!'

মার কথা শুনতে শুনতে আমিনার চোখের পাতাগুলো কেঁপে উঠল একটু। চোখ ছলছল করল। কিছু বলল না সে। আফসানা হাত ছেড়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমিনার চোখের জল এবার টপটপ করে গড়িয়ে পড়ল। কী যে এক সীমাছাড়া হীনম্মন্যতা দখল করে নিল মন! কালো মেঘের মতো গুমোট হয়ে গেল যেন

আশপাশ। নয় ও দশ বছরের রাহা-নুহা নীরবে সরে গেল ঘরের কোণে পড়ার টেবিলে। যেন কিছুই শোনেনি এমনভাবে দুজন আঁকাআঁকিতে মন দিল। আমিনা নিজ হাতেই চোখের জলটুকু মুছল। আসমা দাঁড়িয়ে ছিল পাশেই, আমিনার পাশে বসে পড়ে আমিনার কোমল হাতদুটো ধরল। একটু আগের হাসির উচ্ছ্বলতা বাতাসে মিলিয়ে গেছে। আমিনা আসমার দিকে না তাকিয়েই ধীর কণ্ঠে বলল, 'আমি কেন যে তোর মতো সুন্দরী হয়ে জন্মাইনি! অসুন্দর বলেই লোকে ফিরে যায়। সুরা ফাতিহা তো একটা বাহানা মাত্র।'

আসমা বোনের মুখ আলতো করে ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'আপু, আমার চোখের দিকে তাকাও। দাদি বলেন আমার চোখদুটো ঘোড়ার ডিমের মতো। সময় এলে লোকে কিন্তু অশ্বডিম্ব বলে আমাকেও ফেলে যাবে। লোক শুধু যে ফরসা খোঁজে তা তো নয়; দাঁত দেখে, চুল দেখে, চোখ দেখে, তবু তো শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়। তাকদির তো আল্লাহ...' আসমা কথা শেষ করতে পারল না। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হলে দুজনে চমকে শব্দের উৎস লক্ষ্য করে তাকাল। দরজাকে আড়াল করে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। দরজার নিচ দিয়ে লিকলিকে লম্বা দুখানি পা দেখা যাচ্ছে। আমিনার মুখের বেদনাটুকুর ওপর আলতো হাসির ছায়া ফুটে উঠল। আসমা আমিনার হাত ছেড়ে উঠে গিয়ে বের-হয়ে-থাকা পা-দুটোতে ওর পা দিয়ে আঘাত করে বলল, 'লুকিয়ে আছিস কেন ওখানে?'

'বড়দের গুরুত্বপূর্ণ আলাপের সময় ছোটদের সামনে থাকা উচিত নয়।' দরজার আড়াল থেকে বেরিয়ে উত্তর দিল রাবিয়া।

রাবিয়া যেখানে যে বই পায়, পড়ে। এই তিন-চার বছরে সে ঠিক কতটি বই পড়েছে তার হিসেব যদিও নেই, কিন্তু যখন কথায় কথায় বইয়ের মুখস্থ ডায়লগ কিংবা পণ্ডিতি ফলায়, আসমা সহ্য করতে পারে না। 'কথায় কথায় পণ্ডিতি' বলতে বলতে আসমা ওকে আবারও মারতে গেলে আমিনা চেঁচিয়ে বাধা দিয়ে বলল, 'আহা, মারছিস কেন ওকে শুধু শুধু!' সে উঠে রাবিয়ার হাত ধরে

এনে নিজের সামনের চেয়ারে বসিয়ে ওর অগোছালো কোঁকড়ানো চুলগুলোতে দুটো ক্লিপ লাগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে পাগলি? আম্মু যে সেই কখন থেকে তোকে খুঁজছে!'

রাবিয়া কথাটা শুনল না। সে ভাবছিল আমিনার কথা। তার গম্ভীর মুখখানায় আরও একটু গাম্ভীর্য ফুটিয়ে সে বলল, 'বড় আপা, তোমাকে দুটো পরামর্শ দিতে চাই।'

আসমা ভেংচি কাটল, 'তোমাকে পরামর্শ দিতে হবে না। আম্মু ডাকছে, যা এখান থেকে!'

আমিনা আসমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই এমন করিস কেন সব সময়? বলতে দে কী বলতে চায়।'

'সুন্দরীরা অহংকারী আর নিষ্ঠুর হয়, ওকে পাত্তা দিয়ো না, বড় আপা'—মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল রাবিয়া।

আমিনা হেসে ফেলল। আসমা রেগে ওর মাথায় আরেকটা চাটি বসিয়ে দিলে রাবিয়া অহংকারী আর নিষ্ঠুর সুন্দরীকে নির্দ্বিধায় অগ্রাহ্য করে আবারও বেশ একটা ভাব নিয়ে ঠিক বড়দের মতো অভিজ্ঞ গম্ভীর কণ্ঠে আমিনাকে বলল, 'গতকালই *মসনবি*তে পড়লাম, জালালুদ্দীন কী বলেছেন জানো?'

'কী বলেছেন?'

'বলেছেন : "পৃথিবীকে মনে করো একটা পাহাড়। তুমি যা-ই বলো না কেন, কথাটির প্রতিধ্বনি তোমার কাছে ফিরে আসবে। কখনও বোলো না, আমি গান গাইলাম সুন্দর আর পাহাড় প্রতিধ্বনি পাঠাল কুৎসিত। এ তো অসম্ভব।" সুতরাং আপু, নাকটা যদিও একটু বোঁচা তোমার, শরীরের রং খয়েরি, কিন্তু তাতে কী বলো—তোমার মন যদি সুন্দর হয়, এই পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই তোমাকে অসুন্দর প্রতিধ্বনি পাঠাবে। একদিন না একদিন পৃথিবীর সকল মানুষ তোমাকে পছন্দ করবে।'

আমিনা চমৎকৃত হল ওর কথায়। এইটুকু মেয়ে এত চমৎকার একটা কথা বলে ফেলল! এত বই পড়ে উপকার বৈ অপকার তো হয়নি। তাও মা বই হাতে নিলেই ওকে কেন যে এত বকা দেন! সে বলল, 'সকল মানুষ পছন্দ না করলেও হবে, কিছু মানুষ পছন্দ করলেই আমার চলবে। কী অবস্থা করে রেখেছিস তুই চুলের! আসমা, চিরুনিটা দে তো'—বলতে বলতে আমিনা নিজেই হাত বাড়িয়ে চিরুনিটা আনতে গিয়ে মুখ তুলে দেখল, আফসানা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। রাবিয়া টের পেল না আফসানা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সে নিজের মনে বলে চলল, 'তুমি কেন এত ভয় পাও, বড় আপা? ভয় পেয়ে সুরা ফাতিহা ভুলে যাও, কী আজব ব্যাপার তাই না! আচ্ছা, আমি তোমাকে ভয় না পাওয়ার কৌশল শিখিয়ে দিই। শোনো, ওই যে বাচ্চাদের একটা গল্প আছে না—এক রাজকন্যা ও এক ব্যাঙ রাজপুত্রের গল্প। তুমি ভাবতে পারো ঠিক সে রকম। ধরো, এই ঘর একটি সাম্রাজ্য, তুমি এই সাম্রাজ্যের প্রধান রাজকন্যা। সে দিকে বর ব্যাটা এই রাজ্যের কোনো এক জলাশয়ে ঘাপটি মেরে থাকা একটি ব্যাঙ...।' আমিনা ওর কথা শুনে হাসতে শুরু করল। রাবিয়া বলল, 'হেসো না বড় আপা, বরকে ব্যাঙ ভাবলে আর ভয় করবে না দেখো। সে শুধু ঘ্যাঙরঘ্যাং করতে জানে, আর কিচ্ছুটি না। আর তুমি কত কিছু পারো—সেলাই, রান্না, ঘর মোছা, কাপড় কাঁচা, আরও কী কী যেন পারো তুমি...?'—খুব মনোযোগ দিয়ে মনে করার চেষ্টা করল সে, আর ঠিক তখনই আফসানা পেছন থেকে ওর কান টেনে ধরে কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এখানে বসে বসে জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, না? চলো আমার সাথে, তারপর জ্ঞান বের করছি দাঁড়াও!'

রাবিয়া মায়ের হাত ওর কান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মায়ের পিছু পিছু গেল রান্নাঘরে। ভেবেছিল পিঠে কিছু উত্তমমধ্যম পড়বে, কিন্তু আফসানার আজ মন ভালো। তিনি একটা ছোট কাপ ধরিয়ে দিলেন রাবিয়ার হাতে—'দোতলায় নাদিমদের ঘরে গিয়ে এক কাপ লবণ নিয়ে আসো যাও।'

'মা, আসমা আপাকে বলো না।'

'প্রতিদিন তো একই গান গাইতে পারব না, ও যে বড় কত বার বলব!' বিরক্ত হয়ে বললেন আফসানা।

'রাহা? রাহাকে বলি?'

'গেলি তুই!'

অগত্যা রাবিয়াকে যেতে হয়।

শহরের শেষ মাথায় অবস্থিত বাহাদুরপুর। আর বাহাদুরপুরের শেষ বাড়িটা উসমান সাহেবের। যদিও ভাঙাচোরা আরও একটা বাড়ি আছে দিগন্তের ওই মাথায়, কিন্তু গাছগাছালি আর বুনো আগাছায় ভরা বাড়িটাতে কেউ থাকে না বলে ওটাকে কেউ বাড়ি বলে না; সবাই জঙ্গলবাড়ি বলে ডাকে। সুতরাং উসমান সাহেবের বাড়িটাই শহরের শেষ বাড়ি। বাড়িটা উনার বাবা বানিয়েছেন। বেশ বড় বাড়ি। দোতলা বাড়ির নিচতলার একদিকে উসমান সাহেবের অংশ, অন্যদিকে উসমান সাহেবের বড়ভাই আনিসুজ্জামানের অংশ। আনিসুজ্জামান সফল বিজনেসম্যান। বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে শহরে আলাদা একটা বিলাসবহুল বাড়িতে থাকেন। কয়েক মাস পরপর বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে বিদেশ ঘুরে আসেন। খুব একটা এ বাড়িতে আসেন না, তাই সে দিকটা উসমান সাহেবের বসার ঘর ও বোনদের জন্য বরাদ্দ থাকে। আর দোতলার পুরোটাই ভাড়া দেওয়া। এক পাশে নাদিমরা থাকে, অন্যপাশে হুমায়ুন সাহেব আর তার স্ত্রীর সন্তানহীন সংসার। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরিজীবী। দিনের সিংহভাগ সময় তারা বাইরেই কাটান। সুতরাং রান্নাবান্নার মতো ঘরোয়া বিপদে আফসানা আর নাদিমের মা একে অন্যের ভরসাস্থল।

রাবিয়া নাদিমের ঘরের সদস্যের মতো হলেও আজ যাওয়ার ইচ্ছে নেই তার। নাদিমের সাথে কথা বন্ধ। বিশেষ কোনো ব্যাপার নয়। নাদিমের ছোট দুই ভাইবোন রাবিয়ার বন্ধু, সবাই মিলে গত সপ্তাহে লুডু খেলতে বসেছিল, রাবিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত

হয়েছে। সেই থেকে নাদিমের সাথে কথা বলছে না। নাদিম তাকে হারিয়ে দেবে এটা তার কল্পনায়ও ছিল না। সে রাবিয়ার অঘোষিত পাহারাদার। ঝগড়া কিংবা খেলা—নাদিমের চোখের সামনে যতক্ষণ রাবিয়া আছে ততক্ষণ নিরাপদ। তার উপস্থিতিতে কোনো অসুবিধা অথবা অপ্রাপ্তির অসুখে ভুগতে হয় না। নাদিম রাবিয়ার সাথে কথা বললে তার কণ্ঠে থাকে স্নেহ। রাবিয়ার দিকে তাকালে তাতে থাকে প্রশ্রয়। সবাই মিলে লুডু খেললে ইচ্ছে করে ভুলভাল চাল দেয় সে, যতক্ষণ না রাবিয়া জিতে যায়। এই প্রথম রাবিয়া লুডুতে এভাবে হেরেছে। নাদিমের অপ্রতুল স্নেহে রাবিয়া এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, হঠাৎ করে নাদিম ভাই জিতে গেল আর সে হেরে গেল—এটা সে মেনে নিতে পারছে না। নাদিম তাকে অনেকবার সরি বলেছে, কিন্তু রাবিয়া একটা কথাও বলেনি। অথচ এখন কিনা ওদের ঘরেই যেতে হচ্ছে! তাও লবণ আনতে! রাবিয়ার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগছে, কিন্তু সে নিরুপায়। অনিচ্ছাকে জোর করে মন থেকে ঠেলে হাঁটি হাঁটি পায়ে রাবিয়া নাদিমদের ফ্ল্যাটের সামনে এসে দাঁড়াল। ওদের দরজাটা দিনদুপুরে ভেতর থেকে বন্ধ। রাবিয়া বিড়বিড় করতে লাগল, হে আল্লাহ, নাদিম ভাইয়ের সাথে যেন দেখা না হয়! তারপর দরজায় নক করতে গেলে নক করার আগেই দরজা খুলে গেল। নাদিম দাঁড়িয়ে আছে।

'কী চাই?' কপাল কুঁচকে রাবিয়ার মতো বিরক্তির ভঙ্গি করল সে।

—আম্মু লবণ নিতে পাঠিয়েছে।

—কেন? তার তিতকুটে মেয়েটিকে ডেকচিতে ছেড়ে দিতে পারেন না?

—কী বললে?

—কিছু না। তামাশা করলাম। তামাশা বোঝো না?

—আমার পথ ছাড়ো!

'ছাড়লাম।' দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল নাদিম।

রাবিয়া ভেতরে গেল। কারও সাড়াশব্দ নেই। খালাম্মার রুমে গেল, নাবিলার রুমে গেল, রান্নাঘরে গেল, একটা রুম ব্যতীত সবগুলো রুম খুঁজে দেখল, কোথাও কেউ নেই। পুরো বাসা খাঁ খাঁ করছে! সে আবার সামনের ঘরে ফিরে এল। দরজার পাশে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মিটিমিটি হাসছে নাদিম।

'সবাই কোথায়?' বিরক্তি চেপে বলল রাবিয়া।

—বাসায় নেই দেখতেই পাচ্ছ।

—আমাকে রান্নাঘর থেকে লবণ এনে দাও।

—তুমিই নিয়ে আসো। বাসাটা তো তোমারও।

—আমার বাসা মানে?

—প্রতিবেশীর বাসা মানেই নিজের বাসা।

—এটা আমার বাসা নয়। আমার বাসা হলে যে ঘরে ইচ্ছে সে ঘরে যেতে পারতাম আমি।

—যে ঘরে ইচ্ছে সে ঘরেই যেতে পারো তুমি।

—তোমার ঘরে তো যেতে পারি না। সব সময় দরজা বন্ধ থাকে। এখনও ওপরের সিটকিনি লাগানো, একটুর জন্য আমি নাগাল পেলাম না।

সে চেষ্টা করেছিল শুনে নাদিম হেসে ফেলে বলল, 'সে তো এই বাসার কেউই যেতে পারে না। তবে তুমি যেতে পারবে। শুধু একটা শর্ত আছে।'

'কী শর্ত?' চোখে উৎসুক দৃষ্টি রাবিয়ার।

'আমার সাথে আর কখনও আড়ি দিতে পারবে না।'

'দেব না। এবার নিয়ে চলো তোমার ঘরে।' এমন সহজ শর্ত মুহূর্তেই মেনে নিল রাবিয়া।

নাদিম নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে কয়েক সেকেন্ড। কী যেন ভাবে। তারপর বলে, 'এখন না। যখন সবাই বাসায় থাকবে তখন এসো; নিয়ে যাব আমার ঘরে।'

রাগে দাঁত শক্ত হয়ে আসে রাবিয়ার। নাদিম তাকে মিথ্যা বলছে! মিথ্যা সে সইতে পারে না। রাগে-দুঃখে দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'এই বললে নিয়ে যাবে এখন বলছ পরে এসো। তুমি একটা মিথ্যুক, তোমার সাথে আমি আর কখনও কথা বলব না!' কথা শেষ করে দরজার দিকে ছুটতে গিয়ে ভেজানো দরজায় ধাক্কা খায় একটা। নাদিম সরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাবিয়া দরজাটা খুলে ছুটে বেরিয়ে যায়। পেছনে নাদিম চিৎকার করে ওঠে, 'এই পাগলি! লবণ তো নিয়ে যা!' কিন্তু ততক্ষণে রাবিয়া আফসানার রান্নাঘরে পৌঁছে গেছে। তাকে হাঁপাতে দেখে আফসানা 'কী হয়েছে' জিজ্ঞেস করলে রাবিয়া এবার নিজেই মিথ্যা কথা বলে, 'ওদের বাসায় কেউ নেই। নাদিম ভাই দরজা খুলেছিল। আমাকে দেখে বলল, দরজায় ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভেঙে দিয়েছি, তাই সে নাকি আমার পা ভেঙে দেবে।'

'সে কি!' আফসানা অবাক হন।

—হুঁ! শুধু তাই নয়, বলেছে পা ভেঙে নাকি হাতে ধরিয়ে দেবে।

—আজব ছেলে তো, লজ্জায় কথাই বলে না, এতকিছু বলে ফেলল!

—আরও বলেছে...।

—থাক থাক, আর বলতে হবে না। দোকানেই চলে যা। এ ছাড়া আর কী উপায়! মেহমান আসবে বিকেলে, এক্ষুনি লবণ না হলে তো চলবে না।

রাবিয়া দোকানে যেতে রাজি নয়। সে বেশ কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করল, অজুহাত দেখাল বেশ কয়েকটা। কিছুতেই কাজ হল না। শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়ে তাকে যেতে হল।

গলির মোড়েই দোকান। দুপুরের পরপর রাস্তা একটু বেশিই নির্জন থাকে। নিত্যদিনের হই-হুল্লোড় আটকে যায় নিদ্রামগ্ন দুপুরের গোলকধাঁধায়। রাস্তার নেড়ি কুকুরটাও অলস শুয়ে নাক ডাকে। কদাচিৎ কোনো ভিক্ষুক হেঁটে যায় দোকান পেরিয়ে ঝিমুতে থাকা রাস্তা ধরে রাবিয়াদের বাড়ি পর্যন্ত। এই ঝিমুতে থাকা রাস্তাটাই রাবিয়ার পা-দুটো আঁকড়ে ধরছে। ফিসফিস করে বলছে যেন, যেয়ো না! যেয়ো না! রাবিয়ার সাইকেলটা বাড়িতে আমগাছের গুঁড়িতে শুইয়ে রাখা একা। নিয়ে আসতে পারত। রাস্তা ধরে যতই চলতে থাকল, রাবিয়ার পা-দুটো কয়েক মণ ওজনের ভারী মনে হল। মা কেন যে শোনে না ওর কথা! মা কেন বোঝে না ওর ভালো লাগে না। মা ভাবে রাবিয়া আলসে, তাই এত আপত্তি। মা ভাবে রাবিয়া কখনওই তার কথা শোনে না; প্রতিবার ধমকায়, বকে। রাবিয়াকে তাই যেতেই হয়। আজও ধীর পায়ে হেঁটে গেল সে। সে গেল শামুকের গতিতে আর তারপর যখন ফিরে এল লবণের প্যাকেট হাতে—হরিণের মতো দ্রুত; কিংবা পাখির মতো, যেন সে উড়ে এল। লবণের জন্য মায়ের এত তাড়া ছিল, কিন্তু বাড়িতে সে ঢুকল না। নিজেদের বাড়ির গেট ছাড়িয়ে দূরের ওই গেটবিহীন পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে ছুটে গেল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল গাছগাছালি-ভরতি ছোটখাটো জঙ্গলের মতো বাড়িটাতে। সেই জঙ্গলে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা ছাতিম গাছ। রাবিয়ার প্রিয় সেই গাছ। মা আর দাদি কত বকা দেয়—ওখানে একা একা যাবি না, জিনে ধরবে। রাবিয়া তবু যায়। গাছটার নিচে বসে প্রায়ই গল্পের বই পড়ে। আজ সে এক দৌড়ে গাছটার কাছে এসেই আশ্রয় নিল। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল সে। কাঁদল—মায়ের প্রতি দুঃখে না-কি ভয়ে, বুঝতে পারল না। অভিমান হল তার, সাথে খুব ভয় পেল। যেন কোনো এক অজানা জন্তুকে ভয় পেয়েছে সে। কেউ তাকে দেখল না। কেউ তার কান্না শুনল না। কেউ তার কথা জানল না। ঘণ্টাখানেক পর আফসানা উসমান সাহেবকে লবণ নিয়ে আসার জন্য ফোন করলেন। মেয়ে যে

খেলতে পালিয়েছে তাতে তার কোনো সন্দেহ ছিল না। মেহমান আসার কথা না থাকলে মেয়েকে যে তিনি কী করতেন তার একপ্রস্থ বর্ণনা যখন স্বামীকে দিচ্ছিলেন, তখন বাইরের দরজার কাছ থেকে নিঃশব্দে নাদিমের মূর্তিটা সরে গেল। কোথাও চলে গেছে রাবিয়া। কোথায় কে জানে! নাদিম খোঁজ শুরু করে যখন রাবিয়াকে আবিষ্কার করল, তখন সে ছাতিম গাছের নিচে লবণের প্যাকেট বুকে ধরে গুটিশুটি শুয়ে ঘুমাচ্ছে। তার চোখের কোণে জলের দাগ। নাদিম ভাবল আফসানা আন্টি হয়তো দোকানে পাঠানোর জন্য একটু বেশিই বকা দিয়েছেন, তাই কেঁদেছে। নাদিম কোমল কণ্ঠে ডেকে তুলল তাকে। তারপর সাথে করে নিয়ে এল বাড়িতে। সে হেঁটে এল যেন ঘোরের ভেতর। দুপুরের নির্জনতা চারদিকে হু হু করলেও রাবিয়াদের ঘর থেকে একটু পরপর ভেসে আসছিল রাবিয়ার বোনদের রিনিঝিনি হাসির শব্দ। নাদিম রাবিয়ার সাথে বাড়ির ভেতরে পৌঁছে দেখল, ওদের বসার ঘরের দরজাটা সব সময়ের মতোই হাট করে খোলা। বসার ঘরে কেউ নেই। রাবিয়া বসার ঘরের পেছনে যে ঘরটি সেখানে ঢুকল। নাদিমও ঢুকল পিছু পিছু। সেখানেও কেউ নেই। পরিপাটি করে ঘরটি সাজানো। কেউ এলেই শুধু গোছানো হয় এই ঘর। না হয় সারা বছর এ ঘরে ছড়িয়ে থাকে রাজ্যের সরঞ্জাম—বই, পত্রিকা, রেডিও, বাইরে যাওয়ার জুতো, ব্যাগ ইত্যাদি। রাবিয়া নাদিমের দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের ঘরে এসেছ কেন তুমি? তোমার সাথে আড়ি আমার ভুলে গেছ? যাও আমাদের ঘর থেকে!'

কথা শেষ করেই সে শুয়ে পড়ল বিছানায় এবং মুহূর্তেই তলিয়ে গেল গভীর ঘুমে। নাদিম সব ভুলে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল বিছানার দিকে। সবুজ রঙের বিছানায় হলুদ রঙের জামা পরিহিত রাবিয়াকে মনে হচ্ছে, সবুজ ঘাসে যেন একটা হলুদ ফুল ফুটে আছে। নাদিমের সতেরো বছরের বুকটা কী যে এক বেদনায় তোলপাড় করে উঠল! হলুদ ফুলটির কপালে উপচে-পড়া-চুলগুলো

আলগোছে সরাতে গিয়ে কী ভেবে হাতটা ফিরিয়ে নিয়ে সন্তর্পণে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। তারপর নিজের ঘরে এসে বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দরজায় ঠেস দিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তার রুমের দেয়ালজুড়ে একটা বালিকার বেশ কয়েকটি ছবি। নিজ হাতে দীর্ঘদিন ধরে যত্ন নিয়ে একটা একটা করে এঁকেছে সে। কেউ জানে না, কেউ দেখেনি, পৃথিবীর সবচেয়ে মনোহর বালিকাটি বাস করে নাদিমের দেয়ালে। নাদিম এ কারণেই তার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেয় না। নাদিমের দেয়ালজুড়ে জীবন পেয়েছে দুরন্ত বালিকাটি—তার বাসনার মতো চোখ, তার মেঘের মতো চুল, বইয়ের আড়ালে কুয়াশামাখা হাত, তার অভিমান-অপরূপ, তার পুরোনো সাইকেল, তার সমস্ত শৈশব। কিন্তু এই ছবিরা কি আজকের ছবিটির বিন্দুও ধারণ করতে পারবে? রং আর তুলি খুঁজে নিল শিল্পীর হাত। বুকের উত্তাপটুকু বের না করলে মুক্তি নেই। ক্যানভাসে অচিরেই ফুটে উঠবে সবুজ বিছানার মাঠ আর হলুদ বসন্ত।